গ্রামীণ ফোনের ‘অপেক্ষা’ ভিজুয়াল তফসির[•]

তৈমুর রেজা

টেলিভিশনের জন্য বানানো বিজ্ঞাপনচিত্র বোধকরি অহৈতুকী অবহেলার শিকার। সমাজ যেভাবে শিল্পকলার দিকে কানখাড়া রাখে, টেলিভিশন কমার্শিয়াল বা টিভিসির কপালে সেই হুঁশিয়ারি জোটে নি। কমোডিটির বিক্রি-বাট্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেই বোধহয় একে একনিষ্ঠভাবে লক্ষ্মীর ‘চ্যালা’ বলে ভ্রম হয়েছে; সরস্বতীর সঙ্গে তার গভীর অনুরাগ আর চোখে পড়ে নি। আমরা এই সম্প্রীতির কথা রাষ্ট্র করব ঠিক করেছি।

গোড়াতেই টিভিসি নিয়ে যে চলতি ধারণা বাজারে আছে সেটা বদলে নেয়া হচ্ছে। টিভিসিকে আমরা ‘ন্যারেটিভ সিনেমা’ হিসেবে পাঠ করব। এর নগদ কারণ হচ্ছে, যেসব গুণপনার নিরিখে আমরা ন্যারেটিভ সিনেমা শনাক্ত করি, তার সমস্ত গুণই টিভিসির মধ্যে পাওয়া সম্ভব; আসলে আকসারই পাওয়া যায়। একথা পূর্বাহ্নেই দেশের নামজাদা টিভিসি-নির্মাতাদের কেউ কেউ বলেছেন, আমি তার প্রতিধ্বনি করলাম মাত্র।

ন্যারেটিভ সিনেমা বলার পেছনে যে দ্বিতীয় যুক্তি আমরা হাজির করব, সেটা একটু ঘোরালো। আমাদের বাস্তব জীবনের ওপর রিপ্রেজেন্টেশনের প্রভাব নিয়ে গত কয়েক দশকে এন্তার কথাবার্তা হয়ে গেছে। সমাজের মধ্যে যেসব চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ চালু থাকে, তার একটা ঢাউস-পর্ব রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে গড়ন পায়— এই মত আজকাল বেশ শক্তিশালী। এরকম তাত্ত্বিক পাটাতন থেকে ভাবতে গেলে আমজনতার ওপর টিভিসির আছর দুর্বিষহ হবারই কথা। টিভিসিকে তাচ্ছিল্য করলে এই বিরাট প্রভাব আমলে নেয়া কঠিন। এই ব্যারিকেড সরানোর জন্যও টিভিসির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো জরুরি।

গৌরচন্দ্রিকা শেষ। এবার মূল প্রস্তাব। আমরা এখানে নামজাদা চলচ্চিত্রকার অমিতাভ রেজার *অপেক্ষা* নামের একটি টিভিসি ওরফে ন্যারেটিভ সিনেমার তফসির করব।[১] বলাই বাহুল্য, তফসির সহি হবে না। কবির মনোভূমি হেতু দুষ্ট হবে। আমাদের বিশ্বকবি প্রত্যয় দিচ্ছেন, এ-ভ্রমাত্মক অযোধ্যাও সত্য। সেই ভরসাতেই এই আখ্যান পাতা হলো। ছবির সম্পর্কে তথ্য হচ্ছে এই : গ্রামীণ ফোনের একটি বিজ্ঞাপন হিসেবে এই ছবিটি তৈরি হয়েছে। অনুমান করি, এই টিভিসি দেখেন নি এমন প্রাণী বাংলাদেশে বিরল হতে আর বাকি নেই।

[•] এই লেখার একটি প্রাথমিক সংস্করণ ফেসবুক নোট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্করণে অবশ্য ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই লেখার জন্য আমি সুমন রহমান, ফারুক ওয়াসিফ এবং উম্মে রায়হানার কাছে ঋণী। তবে লেখায় প্রকাশিত মতামতের দায়ভার আমার।

[১] অমিতাভ রেজার পৌরহিত্যে, গ্রামীণ ফোনের জন্য এই বিজ্ঞাপনচিত্রটি তৈরি করেছে ‘হাফ স্টপ ডাউন’। ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন রাশেদ জামান। সংগীত পরিচালনা করেছেন হাবিব ওয়াহিদ। আগ্রহীরা ইউটিউব থেকে ছবিটি দেখে নিতে পারবেন; লিংক : http://www.youtube.com/watch?v=Q_cvhvVwObs

২.

১৯৭৫ সালে লরা মালভি ‘ভিজুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[২] সিনেমার ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যে অতিকায় ছায়া বিস্তার করেছে, তার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। শ্রীমতি মালভির প্রস্তাব : ন্যারেটিভ সিনেমার একটি গুরুতর কর্তব্য হলো দর্শকের জন্য ‘ভিজুয়াল প্লেজার’-এর বন্দোবস্ত করা। তাঁর এই প্রস্তাব প্রিসাইজ অর্থে হলিউডি ছবির (এবং এর প্রভাব-বলয়ের বাদবাকি ছবি) বেলায় প্রযোজ্য। ন্যারেটিভ ছবি হিসেবে *অপেক্ষা*র তফসির করতে এই তরিকার শরণ নেয়া হচ্ছে। আমরা মোট দুটো সওয়ালের জবাব খুঁজব।

ক. এখানে দর্শকের জন্য প্রস্তুত ‘ভিজুয়াল প্লেজার’-এর বন্দোবস্তটা কীরকম?

মালভি তাঁর প্রবন্ধে দু’রকম প্লেজারের ওয়াদা দেখতে পেয়েছেন। সিনেমার পর্দায় দৃশ্যমান চরিত্রকে ‘অপর’ হিসেবে চাক্ষুষ করে যৌন-আনন্দ পাওয়া যায়। এই আনন্দের উৎস দর্শকের সেক্সুয়াল ইন্সটিংকট। এরকম আনন্দের নাম ফ্রয়েড দিয়েছিলেন ‘স্কোপোফিলিয়া’। আরেক প্রস্থ আনন্দ আসে ইগো লিবিডোর বরাতে, এক্ষেত্রে পর্দায় যাকে দেখা যাচ্ছে, দর্শক তার সঙ্গে নিজেকে অভেদ করে ফুর্তি লাভ করে। এখানে সারকথা দাঁড়াচ্ছে : দর্শক পর্দায় দৃশ্যমান চরিত্রকে ‘আমার জিনিস’ ও ‘আমি স্বয়ং’ এই দুইভাবে দেখার মাধ্যমে সিনেমা সম্ভোগ করে।

খ. নারী এই ছবিতে ঠিক কোন ভূমিকাটি পালন করছে?

মালভি দেখাচ্ছেন, সিনেমাতে মোট তিনরকম ‘গেজ’ বা দৃষ্টি থাকে। একটি চোখ ‘ক্যামেরা’র, একটি ছবিতে অভিনয়কারী ‘ক্যারেক্টার’-এর, আর একটির মালিক ছবির সামনে বসে থাকা ‘অডিয়েন্স’। এই তিনপক্ষের নজরেই নারী ‘ইরোটিক অবজেক্ট’ বা রতিবস্তু হিসেবে দৃশ্যমান হয়। এছাড়া ন্যারেটিভ ছবিতে নারীর আর অন্য ভূমিকা নেই।

আমাদের অভিপ্রেত তল্লাশির জন্য সবার আগে *অপেক্ষা* ছবির প্লট সংক্ষেপে বলে নেয়া দরকার। ছবির কেন্দ্রীয় থিম : অপেক্ষা। রূপবতী, বিরহী এক নারী ‘বাতাস, বৃষ্টি ও আলো’র মধ্যে জনৈক ‘বন্ধু’র জন্য মুখ-ভার-করে এন্তেজার করে। তারপর একদিন আচানক সেলফোনের রিংটোন শুনতে পাওয়া যায়। নারী তখন দৌড়ে ঘরে ঢুকে কল রিসিভ করে। এসময় প্রথমবারের মতো এই বিষাদগ্রস্ত নারীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে। আর ভয়েস-ওভারে দর্শক শুনতে পায় গ্রামীণ ফোনের গুণকীর্তন।

---

[২] লরা মালভির এই প্রবন্ধটি প্রথম ছাপা হয়েছিল, ১৯৭৫ সালে, ব্রিটেনের বিখ্যাত ফিল্ম থিওরি জার্নাল *স্ক্রিন*-এ। পরে তাঁর *ভিজুয়াল অ্যান্ড আদার প্লেজারস* (পেলগ্রেভ ম্যাকমিলান, ২০০৯) বইয়ে প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে।

এই ছবি অত্যন্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য হলেও এর ক্যানভাস মোটামুটি ঢাউস। ‘বিন্দুতে সিন্ধু ধারণ’— এক্ষেত্রে উপমা হিসেবে ভালোই খাটে। আমরা অবশ্য কয়েকটি দিকের ওপর মাত্র নজর দেবো।

সবার আগে ভূগোলের দিকে তাকানো যাক। এই রূপবতী নারী যেখানে অহোরাত্র এন্তেজার করছে, সেটা কেমনতর দেশ? মেয়ের বসবাস প্রায় রূপকথার জগতে। পুরো ছবিতে এই নারী ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো আদমসন্তান দৃশ্যত নেই। ফলে তিনকুলে যে তার কুটুমশ্রেণির কেউ আছে, এমন ভরসা হয় না। এই অনাত্মীয় নারী যেখানে নানা গয়না, পাট-ভাঙা শাড়ি আর জংলি ছাপার ব্লাউজ-বিভূষিতা হয়ে পৌরাণিক এন্তেজার পালন করছে, সেটার ভূগোল হলো ‘সমাজ-নিরপেক্ষ’, ‘দেশকালের অতীত’ এক ‘তেপান্তরের মাঠ’। দারিদ্র্যের ভেক ধরে থাকা এক বিরাট বাড়ি তার এন্তেজারির বুড়ির ঘর।

এই নারীর অপেক্ষার ঢং-ঢাংও বেশ চোখে পড়ার মতো। দৃশ্যগুলো একবার মনে করা যাক। খোলা হাওয়ার মধ্যে জনহীন এক কাশবনের ধারে মুখ বেজার করে অপেক্ষা। ধু-ধু বিলের মাঝখানে বুক-সমান পানিতে নেমে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত বেঁধে বিষণ্ন-বিধুর দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা। রাত্রিবেলা ঘরের বেড়ায় ঠেস দিয়ে দুঃখভারাতুর হাতে গামছায় চুল মুছতে মুছতে অপেক্ষা। এরকম কয়েকটি চকিত দৃশ্যের মাধ্যমেই অপেক্ষার একটি প্রতিমা দর্শকের মনে ছাপা হতে থাকে। ফলকথা, এই নিঃসঙ্গ নারীর দুঃখে দর্শকের মন গলতে শুরু করে, অপেক্ষার মধুরেণ সমাপয়েৎ হোক এমন বাসনা উঁকি মারে দর্শকের মনে।

মেয়েটা যখন এমন নানা কায়দায় অপেক্ষাযাপন করছে, তখন আবহে এই কয়েকটা লাইন বাজতে থাকে একটানা :

> কই রইলা রে
> কই রইলা রে বন্ধু
> কই রইলা রে

গানের বরাতে আমরা জানতে পারছি, একলা বধূ এন্তেজার করছে তার বন্ধুর জন্য। এখানে বন্ধু বলতে ‘ইয়ার-দোস্ত’ ভাবার উপায় নেই, কারণ এ-গানের সুর বাংলার লোকসাহিত্য থেকে আহরিত। এই বন্ধু বাংলার আবহমান পরান-বন্ধু, যার চেনা রূপভেদ হচ্ছে ‘বঁধু’।

এই সেই বন্ধু, যার জন্য নির্বাসিত এই ভূগোলে সাধ্যমতো সেজেগুজে দিন-গুজরান করে নারী। বন্ধুর জন্য এন্তেজারি ছাড়া কি আর কিছু করে সে? আলবৎ। তার বসতবাড়িতে হাঁস-মুরগির আনাগোনা আছে। তাছাড়া এক ঝুম বৃষ্টিতে গরু সমভিব্যাহারে ভিজে একসা হয়ে সে ঘরে ফেরে একবেলা। এর থেকে পশু-পাখিপালনে তার তৎপরতা অনুমান করা যায়। আর একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, একজোড়া পালিশ করা জুতা সে শুকাতে দিচ্ছে রোদে। কিন্তু এখানে তার কর্মকুশলতা প্রমাণিত হয় নি। কারণ অচিরেই তার সাধের জুতা-জোড়া বৃষ্টিতে জবুথবু হতে থাকে।

এই রূপবতী কন্যা অষ্টপ্রহর পাটরানি সেজে থাকে কেন? কার জন্য? কাকে সে রূপ দেখায়?

এইখানে আমরা লরা মালভির সালিশ মানব। তাঁর সিধা-বাৎ ছিল এই : অন্তত দুই রকম ভিজুয়াল প্লেজারের জোগান দিতে ন্যারেটিভ সিনেমা ওয়াদাবদ্ধ। যার মধ্যে একটি স্কোপোফিলিক— পর্দার কোনো চরিত্রকে আপন আওরত হিসেবে সাদর করে যৌন আনন্দ পাওয়া। এই আওরতের সুরত যত লোভনীয় হবে, দর্শকের আনন্দ তত সপ্তমে চড়বে সন্দেহ নেই। তাই মেয়ে রূপবতী। তাই মেয়ের

সাজের বহর। কার জন্য? আমার জন্য। তোমার জন্য। সকলের জন্য। সে রূপ দেখায় আম-দর্শককে। কিন্তু কেবল টিভিদর্শকের জন্যই তার রূপের সওদাগরি চলছে এমন নয়। বন্ধুর কথা একেবারে ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে। যে বন্ধু আসে নি কিন্তু আসবে— তার কি রূপের তৃষ্ণা নেই? থাকাটাই তো দস্তুর।

এই পাটরানির সাজের মধ্যে আরো একটি সাজেশন পাঠ করা সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে বিরহযাপনের যে চিত্র সবচে' প্রসিদ্ধ, সেখানে 'এলায়িত ভঙ্গিমা'ই চোখে পড়বে। হয়ত কাতরা নায়িকার নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই, চোখের নিচে কালি পড়েছে, গায়ের বসন বিস্রস্ত— অপেক্ষার এই প্রণালিই এতকাল অধিপতি-চিত্র হিসেবে হাজির ছিল। কিন্তু এই সিনেমায় আমরা কি এই নির্দেশনা পাচ্ছি যে তেমন এলায়িত অপেক্ষা আর চলবে না? যে নারী অপেক্ষা করে তাকেও থাকতে হবে পাট-না-ভাঙা শাড়ির মতো ধবধবে, সুন্দর?

এখানে আরো একটি দরকারি সওয়ালের কিনারা পাওয়ার সুযোগ আছে। এই ছবিতে নারীর ভূমিকাটা আসলে কী? মালভির সিদ্ধান্ত : ন্যারেটিভ সিনেমাতে নারীর একটাই মোটে ভূমিকা; সিনেমার চরিত্র ও দর্শক— এই দুই তরফের কাছেই সে নিছক 'রতিবস্তু'। মালভির মত তর্জমা করে আমরা বলছি, নাগরের জন্য অপেক্ষা ছাড়াও এই নারীর একটি গুরুতর কর্তব্য : আগুয়ান-প্রায় বন্ধু ও চঞ্চলা দর্শককে 'ইরোটিক প্লেজার' বিতরণ করা। তার এই ভূমিকাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। ফলে, বিলের মধ্যে শোকাহত ডুব দেয়ার সময়েও তাকে প্রাণপণে সেজেগুজে থাকতে হয়। মাঝরাতে চুল শুকানোর সময়েও তাকে গয়না পরে থাকতে হয়। এ-ই তার অদৃষ্ট।

ছবির প্রায় শেষদিকে এসে আমরা দেখছি : মেয়েটি তার বাড়ির অঙ্গনে একটা বেঞ্চির ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মুখ তার, যথারীতি, শ্রাবস্তীর কারুকার্য, সাজগোজ প্রায় সপ্তমে চড়েছে। এসময় আচমকা সেলফোনের রিংটোন শুনতে পাওয়া যায়। সে ধ্বনি কানে লাগতেই এক ঝটকায় ঘুরে তাকায় মেয়েটি। আর ঠিক তখনই, প্রথমবারের মতো, তার সারা মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে। সে পাগলের মতো এক ছুট দেয় ঘরের দিকে। এসময় তার দেহভঙ্গি এতই ডগমগ লাগে যে, দর্শক বুঝে নেয়, অপেক্ষা এই ফুরাল। মানে ছবিও প্রায় শেষ হয়ে এল বলে।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে মেয়েটি বিছানা থেকে ফোন তুলে এক পলকের জন্য নম্বর দেখে রিসিভ করে। প্রায় কাতরকণ্ঠে সে বলে 'হ্যালো'। এ সময়ের তার মুখের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেখানে নালিশ বা অভিমানের লেশমাত্র নেই। ছোট্ট, ভয়ার্ত, ইনোসেন্ট একটা বালিকার মতো সে মুখে ওই তরফের সামান্য প্রসন্নতার জন্য উদ্বিগ্ন কয়েকটি রেখাই বুদ্বুদের মতো খেলা করতে থাকে। তার অভিব্যক্তির সারবত্তা হচ্ছে সমর্পণ। এই সমর্পণ শর্তহীন। কয়েক মুহূর্ত বাদে সে মুখের ভয়-বিহ্বল রঙ মিলিয়ে গিয়ে অনুচ্চ হাসির রেখা দেখা দিতে থাকে।

এই মেয়েটার অপেক্ষার যে বেদনা দর্শকমনে নাড়া দিয়েছিল, ফোনকলের মাধ্যমে তার সদগতি হলো। এ সময় ভয়েসওভারে উচ্চারিত বাণীর মাধ্যমে দর্শক বুঝতে পারে— শোক বা হতাশার আর পথ নেই, কারণ এই ফোন আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনের ফোন। ছবি শেষ হয়ে যায়।

৩.

এবার ছবিটা একটু তলিয়ে ভাবা যাক। বিরহযাতনা এবং তার উপশমের নিটোল কাহিনি। শুরুতে বিরহ সমস্যাটি যত গুরুতর মনে হচ্ছিল, এখন আর তত ভয়াবহ কিছু ঠেকছে না। একটা সামান্য

ফোনকলেই যে এই বিরাট কাঁদুনির মীমাংসা হলো, সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার তো বটেই। এই বিস্ময়ের যে দিকটার কূল-কিনারা করতে পারা নিতান্তই অসম্ভব ঠেকবে সেটা হচ্ছে :

এতদিন ফোন আসে নি কেন?

এর কয়েকরকম জবাব হতে পারে : 'নেটওয়ার্ক ছিল না', বা 'প্রাণবন্ধুর অর্থকষ্ট' ইত্যাদি। নেটওয়ার্কের ঘাড়ে দোষ চাপানোর অবশ্য কোনো উপায় নেই। কারণ ভয়েসওভারে আমরা জেনে ফেলছি, 'দেশজুড়ে ১০ হাজার বিটিএসে তৈরি' এই নেটওয়ার্ক 'নিরবচ্ছিন্ন'। 'বন্ধুর অর্থকষ্ট'ও অনুমান হিসেবে তেমন যুতসই ঠেকে না। গয়নাগাটি, শাড়ি-চুড়ির বহর, তার সঙ্গে পালিশ করা জুতা— এগুলো অর্থাভাবের যুক্তিটাকে দাঁড়াতে দেয় না।

তাহলে এই পুরনারীর এত বিতং করে অপেক্ষা করার মানে কী?

উত্তর হতে পারে : ফোন আসে নি, কারণ 'বন্ধু' ফোন করে নি। সে হয়ত ব্যস্ত ছিল, হয়ত তার ইচ্ছাই হয় নি— এজন্য ফোন আসে নি। এই ব্যাখ্যা খুব অসংগত ঠেকে না। একটা নতুন প্রশ্ন তখন অবশ্য বিজলির মতো ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে দর্শকের মনে। এই নিঃসঙ্গ মেয়েটা মুখ হাঁড়ি করে বসে না-থেকে নিজে থেকে ফোন করে নি কেন? তার তো ফোন আছে। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া নিশ্চয়ই খুব জটিল ব্যাপার। আমরা কয়েক দফা অনুমান পেশ করছি :

ক. এই ফোন থেকে কাউকে ফোন করা যায় না। অর্থাৎ আউটগোয়িং বন্ধ। তেমন যদি ঘটেই থাকে, তবে এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ভাবা যাক : ফোনের কণ্ঠরোধ করে শুধু কান খোলা রাখাটা পরানবন্ধুর অভিপ্রায়। বন্ধুর তরফে এমন হাউস থাকা মোটামুটি দস্তুর, কারণ নারীমাত্রই 'খানকি' স্বভাবের; আউটগোয়িং চালু থাকলে কার-না-কার সঙ্গে 'ফষ্টিনষ্টি' করে, সেটা একটা দুশ্চিন্তা! এখানে নিঃসঙ্গ এই নারীর মাঝরাতে চুল শুকানোর দৃশ্যটার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একটু নজর করলেই ওই দৃশ্যে যৌনতার চাপা বাসনা চোখে পড়বে, যা থেকে বোঝা যায় বিরহী নারীর নিঃসঙ্গতা শুধু মন-পোড়ানি নয়, সেটা দেহও পোড়াচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে নারী নিজের 'যৌন কাতরতা' সামলাতে না-পেরে পরপুরুষের সঙ্গে 'শুয়ে পড়তে' পারে। এতে নারীর সতীত্ব নিশ্চয়ই বিঘ্নিত হয়। আর নারীর সতীত্ব নিয়ে পুরুষালি উদ্বেগ অতি প্রাচীন এক সমস্যা।

   এ জাতীয় উদ্বেগের সবচে' ভালো দৃষ্টান্ত আছে *আরব্য রজনী*র একটি গল্পে। এক দৈত্য তার রমণীকে লোহার সিন্ধুকে তালা দিয়ে রাখে। এহেন কড়া পাহারার মধ্যেও 'ছিনাল' রমণী শত পুরুষের সঙ্গে যৌনক্রিয়া সম্ভব করে ফেলে। আমরা যে নিঃসঙ্গ নারীর গল্প শুনছি ছবিতে, তাকেও কিন্তু বন্দি বলে সন্দেহ করার কারণ আছে। পুরুষের কামনার ধন রূপবতী এই মেয়েটি কি প্রতীকীভাবে বন্দি? যে ভূগোলে মেয়েটিকে স্থাপন করা হয়েছে, সেটা বেশ প্রকটভাবেই নির্বাসনের ইঙ্গিত দেয়। ফোন করতে না-পারার অনুমানটা মাথায় থাকলে মনে হবে, 'প্রভু-মরদে'র জন্য অপেক্ষা ছাড়া এই মেয়ের জীবনে আর করণীয় কিছু নেই।

খ. এই ফোন থেকে অন্যকে ফোন করা সম্ভব, কিন্তু মেয়েটা সেটা পারে না। এই অপারগতার জন্য দায়ী তার মেয়েলি বুদ্ধি। সমাজে এমন ধারণা বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, কতগুলো ব্যাপার আছে এমন, যা ভেদ করতে নারীর বুদ্ধি একান্তই অক্ষম। প্রযুক্তি আবশ্যিকভাবেই তার মধ্যে একটি।

গ. এই ফোন থেকে ফোন করা সম্ভব, ফোন করতে মেয়েটা পারেও, কিন্তু তবু সে ফোন করে না। পরানবন্ধুর মেজাজ ও মর্জির কাছে এত করুণভাবে সমর্পিত তার মন যে ফোন করে মহীরুহের ধ্যান ভেঙে দেবার ঝুঁকি নিতে চায় না। সে বরং বিরহের আগুনে পুড়ে-পুড়ে নিরেট সতী হতে চায়। ছবির শেষ দৃশ্যটা মনে করলে এই অনুমানের পক্ষে যুক্তি পাওয়া যাবে। পরানবন্ধুর ফোনকল পাওয়ার পর নায়িকার মান-অভিমানের বালাই ছিল না, তার অভিব্যক্তিজুড়ে ছিল নিঃশর্ত সমর্পণ। এই সমর্পণ ফোন করে ত্যক্ত করার দুঃসাহসের অভাব ইঙ্গিত করে।

এসব অনুমান নিশ্চয়ই তর্কাতীত নয়। পাঠক এর মধ্যে অ্যাবসার্ডিটিও খেয়াল করতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ফোন করলেই যে সংকট উত্তরণ হয়, তা এতদিন কেন মেয়েটার ভোগান্তির কারণ হলো সেটার ঠিক মনপছন্দ ব্যাখ্যা হয় না। যদি এই ঘটনাটা অ্যাবসার্ড বলে মানতে না-চাই, তবে হয়ত একটা অ্যাবসার্ড ব্যাখ্যাই মেনে নিতে হবে আমাদের।

৪.

লরা মালভির কথায় ফেরা যাক। তাঁর মতে, দর্শক পর্দায় দৃশ্যমান চরিত্রকে 'আমার জিনিস' ও 'আমি স্বয়ং'— এই দুইভাবে দেখে। 'আমার জিনিস' কোনটা তার কিনারা আমরা ইতোমধ্যেই কিছুদূর করে ফেলেছি। 'স্বয়ং আমাকে'ও একটু খুঁজে দেখা দরকার। দর্শকের ইগো যার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে আনন্দ পাবে সে মরদ কোথায়?

পুরো ছবির মধ্যে এই নায়িকা ভিন্ন আর মনুষ্য নেই। তাই সাদা-চোখে মরদের দর্শন পাওয়ার উপায় নেই। আমাদের অবশ্য মনে পড়বে, রমণী যে পরানবন্ধুর জন্য অহোরাত্র 'ব্যথার পূজা' করে যাচ্ছে, সেই লোকটা ছবিতে অনুপস্থিত। মানে কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই চোখে পড়বে, সবকিছুর মধ্যে শুধু সে-ই আছে; সকল অপেক্ষা, আয়োজন আর বেদনার পাণ্ডুলিপির মধ্যে কেবল তারই অস্পষ্ট মুখচ্ছবি। এই গরহাজির মানুষটা কে?

আমাদের অনুমান, এই গরহাজির লোকটার সঙ্গেই দর্শকের ইগো নিজেকে আইডেন্টিফাই করে। অনুমানের নানাবিধ কারণ আছে। এই লোকটার জন্যই তো হন্যে হয়ে অপেক্ষা করছে এক মানসলোকের নায়িকা। সে আরাধ্য রমণীর যাবতীয় কাতরতা, দুঃখবোধ; আর আনন্দ যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, সে এক মহানায়কই বটে। কোনোভাবে এই মানুষটার সঙ্গে নিজেকে গুলিয়ে নিতে পারলেই এই 'হট' রমণীটাকে একেবারে নিজের করে পাওয়া যায়। তাই, কার্যত, এই লোকটার গরহাজিরাই দর্শকের জন্য এক বিরাট মওকা হয়ে দাঁড়ায়। সিগনিফায়ার প্রচ্ছন্ন থাকায় সাবস্টিটিউশন সহজ হয়ে ওঠে; প্রাণবন্ধুর যেহেতু অনড় কোনো প্রতিমা নেই, সেহেতু নিজেকে ওই ফাঁকা মন্দিরে স্থাপন করা সহজ কল্পনা। ফলকথা : সকলেই নিজেকে ওই আরাধ্য নারীর মালিক হিসেবে কল্পনা করতে পারে।

এই গরহাজির লোকটা কেবল 'আমি' বা 'দর্শক' এমন নয়; সে গ্রামীণ ফোনের সম্ভাব্য কাস্টমার। কারণ দর্শক টিভিসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গ্রামীণ ফোনের সিম কিনবে— ছবি প্রযোজনার মোদ্দা উদ্দেশ্য তো এই। ছবির ন্যারেশনে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ ফোন এক আশ্চর্য আবিষ্কার। এই তেলেসমাতির জোরে মহাকাব্যিক অপেক্ষাও এক ফুৎকারে নিভে যেতে পারে। গ্রামীণ ফোনের এত শক্তির উৎস কী— সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা দেয়া হচ্ছে ছবির শেষ দৃশ্যে ভেসে আসা ভয়েসওভারের বার্তার মধ্যে :

> বাতাস, বৃষ্টি, আলোর সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি প্রিয়জন পাশে না থাকে। আর তাই দেশজুড়ে দশ হাজার বিটিএসে তৈরি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক।

এই বাক্যটা ভারি ব্যঞ্জনামূলক। যে বিরহের কাহিনি বলা হচ্ছে এতক্ষণ, তার নিদান বাতাস, বৃষ্টি বা আলোর মধ্যে নেই। অর্থাৎ যেসব প্রাকৃতিক লীলাকাণ্ড এতকাল আমাদের ব্যথাতুর হৃদয়ের মলম হতে পারত, সেসবের জামানা ফুরিয়ে আসছে। শুধু ওসবে এখন আর চলবে না। কারণ 'বাতাস, বৃষ্টি আর আলো'র সব আয়োজন তো পণ্ড, এসব প্রাকৃতিক আয়োজনে সঙ্গহীনা রমণীর মুখে এক তিল হাসি ফোটে নি। এই দুর্লভ হাসি রমণীর মুখ ভরে ছলকে দিল কে? গ্রামীণ ফোনের 'নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্ক'।

এখানে মডার্নিটি আর নেচারের ডিকটমিটা কেউ কেউ মনে করতে চাইবেন। ছবির একটা মোরাল দাঁড়াচ্ছে : নিসর্গের কাছে মানুষের আবেদন নিভে আসছে, ওসব বৃষ্টি-ফিষ্টিতে আর চলছে না, এখন আমাদের সাধ-আহ্লাদ যাকে কেন্দ্র করে ঘুরে মরবে, সেটা হলো মডার্ন প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মধ্যে যে অপার সামগ্রী আছে, তার কাছে খোদার যাবতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিফল মনোরথ।

কিন্তু অন্য একটা দিক থেকে দেখতে গেলে এই ঘটনার তাৎপর্য আরো বেশি খোলতাই হয়। খেয়াল করা দরকার, নিসর্গ এখানে মোটামুটি সেক্সিস্ট কায়দায় পরিবেশিত। 'বাতাস, বৃষ্টি, আলো'র আবেদন নারীর অনুভবে ঠিক যে খোলতাই হতে পারছে না, তার হেতুমূল হলো পরানবন্ধুর বিচ্ছেদ। নারী ও নিসর্গ এখানে পরস্পরের সহগ হিসেবে নির্মিত হচ্ছে, দুই তরফের পক্ষেই নিজেদের পেখম ষোলআনা মেলে ধরাটা একজন পুরুষের উপস্থিতির শর্তাধীন। এভাবে দেখতে গেলে নিসর্গের আবেদন ছোট হয় নি, মরদের অভাবে ঘোমটা দিয়ে আছে মাত্র। ছবির শেষ দৃশ্যে ফোনকল আসার পর অপেক্ষারত নারীর মুখে হাসি ফুটে ওঠার পাশাপাশি বাইরে ঝলমলিয়ে ওঠে রোদ। এতে একদিকে যেমন মরদ-ভজনায় নারী ও নিসর্গের সহগ নির্মিতি প্রকট হয়, অন্যদিকে তেমনি 'মডার্ন প্রযুক্তি' হিসেবে গ্রামীণ ফোনের তাকতও ফরসা হয়ে ওঠে।

কিন্তু কলিকাল! তাই এমন আশ্চর্য আবিষ্কারেও সবসময় কাস্টমারের হুঁশিয়ার মন ভেজে না। ফলে কেবল 'বাতাস বৃষ্টি আর আলো'কে হারিয়ে দেয়া নেটওয়ার্ক-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরস্ত হয় না বেনিয়ার মন। তারা কাস্টমার ধরার জন্য আরো একদফা প্রলোভন পেশ করে। সম্ভাব্য কাস্টমারকে তাই এই ছবিতে অধিষ্ঠান দেয়া হচ্ছে পুরুষালি ফ্যান্টাসির পাহাড়চূড়ায়। সেখানে অনড় কোনো প্রতিমা নেই, তাই পুরুষমাত্রই নিজেকে সেখানে স্থাপন করে এক অনিন্দ্য সতীনারীর মালিক হিসেবে দেমাগ করতে পারে।

এই কল্পনা জাগরুক করতে পারার মধ্যেই ন্যারেটিভ ছবি হিসেবে *অপেক্ষা*র সাফল্য নিহিত।

তৈমুর রেজা সহকারী সম্পাদক, প্রতিচিন্তা। taimur_reza@msn.com